ঠাকুরবাড়ির অন্য ঠাকুর

সুভো ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির এক ‘কালাপাহাড়’ বোহেমিয়ান চরিত্রের সন্ধানে শুভজিৎ সরকার।

পয়েট টেগর কে হন তোমার,
জোড়াসাঁকোতেই থাকো?
বাবার খুড়ো যে হন শুনিয়াছি, মোর কেহ হয় নাকো।’

যৌবনে এমন ছত্র লিখে যিনি বিশ্ববরেণ্য কবিকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, ঠাকুরবাড়ির উত্তরাধিকারী সুভো ঠাকুর, যার পোশাকি নাম সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে ‘কালাপাহাড়’, ‘বোহেমিয়ান’ নামেই সমধিক চিহ্নিত, যিনি পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হাতে পেয়ে সাহিত্যচর্চা, বন্ধুপোষণ ও নানান বিচিত্র খেয়ালে বেশ কয়েকলক্ষ টাকা অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ করে দিয়েও কখনো আক্ষেপ করেননি। দীর্ঘ সাত দশকের কিছু বেশী জীবনকালে (১৯১২-১৯৮৫) সুভো ঠাকুরের পরিচিতি হল যথাক্রমে চিত্রশিল্পী, কবি, পত্রিকা সম্পাদক, শিল্প সংগ্রাহক হিসাবে। ঠাকুর পরিবারের খ্যাতি ও ঐতিহ্যের বাতাবরণে জন্ম হলেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল ঠাকুর পরিবারের বিরুদ্ধে, সনাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও চলতি সাহিত্য ও চিত্রকলার বিরুদ্ধে। তাঁর নিজের জীবনের মূল্যায়ন করেছে তাঁর নিজস্ব অনুনকরণীয় লেখনশৈলী – ‘উপন্যাসের চেয়ে আমার জীবন কি কিছু কমতি যায় অসম্ভবতায়? ... নতুন দিক দিয়ে দেখবার আগ্রহ আমার এমনই যে, যা কিছু করতে চাই যা কিছু লিখতে চাই তার জন্য অন্য লোকের মাড়ানো পথে পা বাড়াতে একান্তই প্রস্তুত নই। চলতি পথকে চিরকাল তারা অগ্রাহ্য করেই চলতে চায় ...।’ ব্যক্তি সুভো ঠাকুর এবং স্রষ্টা সুভো ঠাকুর এরই যেন মূর্ত প্রতীক।

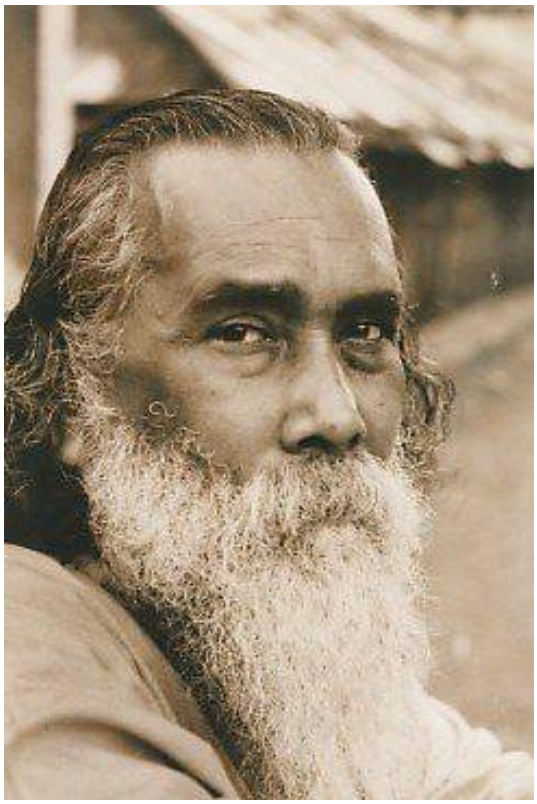

নীল রক্তধারার মাঝ থেকে অকস্মাৎ অভ্যুদয়

কে এই সুভো ঠাকুর? উত্তরের জন্য টাইম মেসিন করে একটু পুরনো দিনের ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় ঘুরে আসতে হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মায়ের মৃত্যু হয় ১৮৭৫ সালের ১০ মার্চ। সারদাসুন্দরীদেবীর অকালপ্রয়াণ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ লিখেছেন হাতের আঙুলের উপর সিন্দুকের ডালা পড়ে আঘাত পেয়েছিলেন মহর্ষি-পত্নী। কেউ স্মৃতিকথাতে জানাচ্ছেন আঙুল মটকে তিনি মারা যান। সারদাদেবীর অস্ত্রপ্রচার হয়েছিল। দেবেন্দ্রপুত্র হেমেন্দ্রনাথ নিজের বাহুমূল থেকে 'বৃহৎ মাংসখণ্ড' কেটে তাঁর মায়ের হাতে প্রতিস্থাপণ করেন। হেমেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি অনালোচিত হলেও তা বিদ্যাসাগরের মতো প্রবাদতুল্য। এই হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ঋতেন্দ্রনাথের ('মুদীর দোকান'-এর স্রষ্টা) সন্তান সুভো ঠাকুর। ঋতেন্দ্রনাথের অন্যান্য সন্তানেরা হলেন সিদ্ধীন্দ্রনাথ (মধ্যম), বাসবেন্দ্রনাথ বা বাসব ঠাকুর (কণিষ্ঠ)। আদতে সুভো ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ঋদ্ধীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই স্বর্গারোহন করেন। তাঁদের মধ্যবর্তী একটি বোন নামকরণের পূর্বে প্রয়াতা হন। সুভো ঠাকুরের প্রথম পত্নী নির্মলা, দ্বিতীয় পত্নী আরতি, যিনি লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার আত্মজীবনী *আমার জীবনস্মৃতি* বাংলায় অনুবাদ করেন। সুভো ঠাকুরের এক কন্যা ও দুই পুত্র – চিত্রলেখাশুভম (স্বামী পৃথ্বীরাজ সেন), সিদ্ধার্থশুভম, সুন্দরশুভম। ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যে সুভো ঠাকুরের হয়ে ওঠার কাহিনী শোনা যাক তাঁর নিজের জবানীতে। সুভো ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দিনান্তের বিদায়কালীন অপরাহ্নের আলোয়। সুভো ঠাকুর বলছেন – 'জন্মানোটার উপর তাঁর হাত ছিল না, হাত থাকলে যে বংশে তাঁর জন্ম, সে বংশে যাতে না জন্মাতে হতো তার জন্য বিধাতার প্রিভিকাউন্সিলে পিটিশন পেশ করতেন তিনি।' কারণ তাঁর কাছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল ভিন্ন এক গ্রহ। 'সে পৃথিবী ছিল না, তার আস্বাদ ছিল অস্বাভাবিক, অন্যরকম। তার অঙ্গে ছিল যেন অন্য কোন গ্রহের আঘ্রাণ। সে জগৎ ছিল অদ্ভুত, অদ্ভুত সেখানকার জীবেরা। সেখানকার লোকেরা ছান্দগ্য উপনিষদ-এর উপদেশ অনুযায়ী চলতো গুনে গুনে পা ফেলে, বেদান্তের দৃষ্টান্তে হাসতো, আর কালিদাসের কবিতার কায়দায় কওয়াকয়ি করতো কথা। শৈশবকাল থেকেই চলতো বংশের রীতি অনুযায়ী অসাধারণ তৈরী করার সাংঘাতিক প্রচেষ্টা। মহা মহা আদর্শের অসংখ্য ইনজেকশানে শৈশব জীবন হত জর্জরিত। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, অরুনোদ্গমের আগেই নিয়মিত বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হতেন, নতুবা স্মেলিং সল্টের তীব্র ঝাঁকুনি ঘুমন্ত শিরা উপশিরায় আচমকা জাগরণের নিষ্ঠুর চাবুকের মতো পড়তো অতি নির্মমভাবে, তারপর শীতল জলে স্নান সমাপন শেষে এক ঘন্টা করতে হত উপনিষৎ পাঠরূপ ভগবৎ-ভজনা, তারপর ব্যায়ামচর্চা অন্তে আরম্ভ হত শিক্ষকের মারফৎ অধ্যয়ণের আয়োজন – শিল্প শিক্ষক, সংগীত শিক্ষক, ব্যায়াম শিক্ষক, এম্নিধারা সংখ্যাহীন শৃঙ্খলিত শিক্ষকদের শিক্ষায় সময়গুলো সর্বদাই সজারুর শরীরের মতই থাকতো সাংঘাতিকরকম কন্টকাকীর্ণ।'

ঠাকুরবাড়ির পুরুষানুক্রমিক প্রথায় এইভাবে 'দেবশিশু' হতে চাননি তিনি। ঠাকুরবাড়ির প্রথানুযায়ী 'ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি আর পায়জামার সঙ্গে লম্বা চুলও' রাখতে শুরু করলেও তাঁর মন চাইত একতলার উঠোনে তাঁর সমবয়সি ভজহরি চাকরের ছেলে বা ছটুলাল দরওয়ানের নাতির সঙ্গে খেলতে। এই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নিয়মনীতি থেকে তাঁর মন চাইত মুক্ত হতে। তাঁর অন্তরের কামনা ছিল ভূমিকম্পে যেন ঠাকুরবাড়ির দালানগুলো ভূমিস্মাৎ হয়।

ঠাকুরবাড়ির 'কালাপাহাড়', ব্ল্যাকশিপ সুভো ঠাকুর

প্রাকৃতিক নিয়মে ঠাকুরবাড়ির দালানের থামগুলো কম্পিত না হলেও তিনি ভূমিকম্পের ন্যায় তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যের ভিত কাঁপিয়ে বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে নেমে এসেছিলেন পঁচিশ টাকা ভাড়ার ভবানীপুরে ইঁদুরের আরামের অধম অতি সামান্য এক ব্যারাক বাড়িতে। সমীর সেনগুপ্ত তাঁর *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন* বইতে লিখেছেন সুভো ঠাকুর 'তাঁর শেষ জীবনে লেখা স্মৃতিকথা *বিস্মৃতিচারণা*-য় প্রকাশ পেয়েছে ঠাকুরবাড়ির বিরুদ্ধে কুরুচিকর ক্ষোভ।' সুভো ঠাকুরের ভাষায় 'আত্মীয়স্বজনের দ্বারা বংশের কালাপাহাড় এই খ্যাতি চিহ্নের দাগ পড়েছিল তার শিড়দাঁড়ায়।' সুভো ঠাকুরকে কেন ঠাকুরবাড়ির 'কালাপাহাড়' বা 'ব্ল্যাকশিপ' বলা হত তার উত্তর তাঁর *বিস্মৃতিচারণা*-র পাতাতে স্পষ্ট।

সরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর আত্মস্মৃতি *জীবনের ঝরাপাতা* বইতে লিখেছেন – 'সেজমামার ছোটো ছেলে ঋতুদার অংশ একজন মাড়োয়ারির কাছে বিক্রিত। ... এগারই মাঘের উপাসনা ও গান যখন চলছে ঠিক সেইসময় সেই অংশের ছাদ ও খড়খড়ি বেয়ে মাড়োয়ারি গিন্নির উনুন জ্বালানোর ধোঁয়া ও ফোড়নের গন্ধ উঠোনে চলে আসে। আর নিচের তলায় উঠোনের গা-সংলগ্ন বাড়ির ভিতরমুখো সব অন্ধকার ঘরগুলি খোট্টা ও দেশি-বিদেশী ভাড়াটেতে ভরা।' সুভো ঠাকুরের এই কাজের পিছনে তাঁর যুক্তি হল তিনি তাঁর প্রপিতামহ মহর্ষির পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার পরিকল্পনায় তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অংশ হস্তান্তরিত করেছিলেন। পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া এই কাজের পিছনে সুভো ঠাকুরের একটি দার্শনিক সুনিশ্চিত মতবাদও ছিল। তাঁর মতে একটা বাড়ি কিছুতেই বাঁচতে পারে না তার বাসিন্দাদের ব্যক্তিত্ব ব্যতিরেকে। কারণ কোনো বিখ্যাত বাড়ি ইঁট চুন সুরকির সমষ্টি মাত্র নয়। তার প্রাণধর্ম অপ্রতিহত রাখতে হলে অর্থাৎ তাকে জীবন্ত করে ধরে রাখতে হলে চাই সেইরকম সব মহান ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ, যা সুভো ঠাকুরের মতে সেই সময়ের জোড়াসাঁকোতে ছ'নম্বরে নিঃশেষিত প্রায়।

ঠাকুরবাড়ির প্রতি সুভো ঠাকুরের বিদ্রোহের অপর কারণ অবশ্যই বৈষয়িক। সুভো ঠাকুরের মতে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর লিখিত রবীন্দ্রজীবনীতে এজমালি জমিদারি ভাগ-বাঁটোয়ারা ব্যাপারে কিছু ভুল তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, মহর্ষির

শেষের দিনগুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনে মিলেই জমিদারি-বসতবাড়ি ইত্যাদি ভাগ-বাঁটোয়ারার উদ্যোগে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহর্ষির এইরূপ শারীরিক অসুস্থতার সুযোগকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন বলে সুভো ঠাকুরের অভিযোগ। হেমেন্দ্রনাথ যেহেতু সেই সময় স্বর্গলোকে তাই তাঁর 'আত্মভোলা', 'প্রচারবিমুখ', 'ঘরকুনো', 'লাজুকস্বভাবের' অধিকারী পরিবারকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁর বিধবা পত্নী শ্বশুরমহাশয় মহর্ষির নিকট ব্যক্তিগতভাবে যে আবেদন করবেন এ রেওয়াজ তখনকার ঠাকুরবাড়িতে অচিন্ত্যনীয়। অতএব হেমেন্দ্র-র তরফে তাঁদের বৈষয়িক স্বার্থ বিনা রিপ্রেজেন্টেশানে বেকায়দায় বেওয়ারিশের মতোই বানচাল হতে বাধ্য হয়। স্বভাবতই নোবেলজয়ী কবি তাঁর কোপ থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর লেখনীতে বৈষয়িক রবীন্দ্রনাথ দেখা দিল এইভাবে – 'নালিশ-মোকদ্দমা ইত্যাদি ব্যাপারে এবং বিষয়বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিত্বশক্তির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন বলে মনে হয় না, অবশ্য এটাও তাঁর জিনিয়াসের আর একটা দিক হিসেবেও ধরা যেতে পারে।'

ঠাকুরবাড়ির জ্যোতির্ময় রবিকে আক্রমণ করেছে অসংখ্য কালো মেঘের দল। বৈষয়িক বিষয়ের পাশাপাশি সুভো ঠাকুরের তীর্যক বাণ থেকে রক্ষা পায়নি বিশ্বকবির সৃষ্টি *সোনার তরী*। ১৯৩৫ সালে প্রতিমাদেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এই বক্তব্যের সারমর্ম প্রকাশ করে – 'সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে এই, চার অধ্যায়কে নিয়ে সৌম্য ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। সুভো ঠাকুর লিখেছেন যে স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ নামক এক ব্যক্তির লেখা থেকে ওটা আমি চুরি করেছি। বাইরে লোকেরা কেউ খুব ভালো বলচে কেউ খুব মন্দ, মাঝের থেকে বইটা বিক্রি হচ্ছে দ্রুত বেগে। জীবনে সত্য মিথ্যে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু পরের লেখা চুরি করতে হয় আত্মীয় ছাড়া এমন খবর অতি বড়ো নিন্দুকের কলম দিয়েও বেরোয়নি।'

আর্ট কালেকশনের অষ্টপ্রহর

কারুশিল্পে আকৃষ্ট হয়ে কিছু শিল্পবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন এবং অনাদরে অবহেলিত এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছিলেন সুভো ঠাকুর। সংগ্রহের নেশা ছিল তাঁর রক্তে। ছবি, মূর্তি, পট, পাটা থেকে পুরোনো আসবাব, ঝাড় লণ্ঠন, এমনকি দোয়াত-কলম, সিগারেট, চুরুটের পাইপ, পুরোনো মানচিত্র – এমন অদ্ভুত সব সংগ্রহে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর বাসস্থান। তাঁর কাছে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠি ছিল। ছিল দুষ্প্রাপ্য বিরল ইঙ্ক পট ও মুঘল আমলের হুকা। ধর্মতলায় কটেজ ইন্ডাস্ট্রির বাড়ির ফ্ল্যাটে এবং এক সময়ে রাসেল স্ট্রিটের বাসস্থানে প্রায়ই নিত্য নতুন সংগ্রহের সামগ্রীতে ঋদ্ধ করতেন গুণগ্রাহীদের। তাঁর এই অভিজ্ঞতার জন্যই ভারত সরকার তাঁকে অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্র্যাফস

বোর্ডের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে একটি সংগ্রহশালা তৈরির স্বপ্ন তাঁর অধরাই রয়ে গেছে।

সঙ্গিনী ঐ চিত্রকলা

সুভো ঠাকুরের ছবির জগতে আসার আগে তার জমি অনেক আগেই কর্ষণ করেছিলেন তাঁর পূর্বসুরীরা। সলতে পাকিয়েছিলেন এবং প্রদীপও জ্বালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত 'বাহুর জোরে ছবি' এঁকেছিলেন গুণেন্দ্রনাথ, 'ওরিন ঠাকুর ছবি লিখেছিলেন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সর্বশেষ রবীন্দ্রনাথ যাঁর ছবি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – 'ওগুলোতো ছবি নয়, যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎসার।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ রীতির পুনরুদ্ধারে এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পের নব জন্মদাতারূপে গণ্য হন। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ছোটবোন সুনয়নী দেবী আধুনিক শিল্পকলার অন্যতম প্রধান নারী চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রৌঢ় বয়সে আঁকা শুরু করেছিলেন এবং সর্বোপরি কোনো প্রথাগত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে না থেকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ ধারায় এক নতুন পথের পথিক। সুভো ঠাকুর তাঁর পূর্বসুরীদের শৈল্পিক জুতোতে পা গলায়েও তিনি ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্য ও পরম্পরায় এক বিদ্রোহী চিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে প্রয়াসী ছিলেন। ছবি আঁকায় তাঁর নিজস্বতার স্বাক্ষর রয়েছে। পূর্ব আর পশ্চিম মিলিয়ে সম্পূর্ণ নতুন স্টাইল তাঁর। দু'বছর সরকারী আর্ট স্কুলে পড়েছেন। তাঁর মানসগুরু যামিনী রায়। আর এক গুরু ঈশ্বরীপ্রসাদ। চিত্রশিল্পী সুভো ঠাকুর শুধু ছবি আঁকেননি, পাশাপাশি শিল্পকলার ব্যবহারিক দিকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। বস্ত্রবুননের মধ্যে চিত্রকলার রূপবন্ধনে এক অন্যমাত্রিকতায় তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশ পেতে থাকে। চিত্রশিল্পে এক নতুন প্রয়াসকে উপস্থাপন করেন – 'ছোট ছোট বর্গাকার খণ্ড দিয়ে, প্রায় জ্যামিতিক শৃঙ্খলে প্রতিকৃতি রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় পরম্পরায় কারুকলার সমঝদার। তাঁর ছবিতে এই কারুশিল্পীর শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে অলঙ্করণ প্রীতিও যুক্ত রয়েছে।'

বেঙ্গল স্কুল-এর শিল্পচিন্তা থেকে দূরে সরে এসে প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন, কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন তরুণ শিল্পী ১৯৪৩ সালে গঠন করেছিলেন *ক্যালকাটা গ্রুপ*। সুভো ঠাকুর এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যদিও রামকিঙ্কর ছিলেন প্রধানতম, তবে তিনি ছিলেন গ্রুপের আমন্ত্রিত সদস্য। দক্ষ কলাকুশলী শিল্পী বংশীচন্দ্র সেনগুপ্তকে তিনিই আবিস্কার করেন কাশ্মীরে। এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠার পেছনে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিল কলাশিল্পের ভাষাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে শক্তিশালী করা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানো। যে সময় এই গ্রুপটির প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ সালে, সেই সময় চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পরাধীন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন। তৎকালীন সময়ের যে ভয়ানক খরা দেখা দেয় যা গ্রামগঞ্জের হাজারো মানুষকে সর্বসান্ত করে দিয়েছিল সেই খরার

ভয়ানক রূপ দেখে জন্ম *ক্যালকাটা গ্রুপ অব আর্টিস্ট* । এই গ্রুপের সদস্যরা মানবিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গ্রুপের জীবৎকাল মাত্র দশবছর। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেও সুভো ঠাকুরের গ্রুপের প্রতি আকর্ষণ ও আস্থা হারানোর কারণ বোধ হয় প্রতিবাদী মানসিকতার এক শিল্পীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র গৌণ হয়ে যাওয়া। প্রতিবাদী শিল্পী সুভো ঠাকুর চিরাচরিত পথে না হেঁটে আপন পথের সন্ধান করেছেন। তাঁর কাজ জওহরলাল, নেতাজি সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বহু পরিচিত প্রতিকৃতিগুলিকে প্রকাশ করছিলেন বস্ত্র বুননের মাধ্যমে এক নতুন নিজস্ব আঙ্গিকে। সুভো ঠাকুরের তুলনা সুভো ঠাকুর নিজেই। শিল্প ইতিহাসবেত্তা ও. সি. গাঙ্গুলি যথার্থই বলেছেন – 'Subho Tagore has made able attempts to recover Indian painting and to make it run on new paths. He has scrupulously avoided any imitation or repetition of the manners of Dr. Abanindra Nath Tagore. He has, therefore, been a Tagore without being a Tagorite, an Indian artist without the archaisms of old Indian art, yet without loving the aroma and flavor of it Indianness.'

কালি-কলম-মন

তিনি যেমন চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে 'a Tagore without being a Tagorite', তেমনি তিনি সাহিত্যেও ভিন্ন পথে হেঁটেছিলেন, প্রবর্তন করেছিলেন অননুকরণীয় স্টাইল। প্রথম বই *মঞ্জুরী* যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মোটে বারো-তেরো। ভূমিকা লিখেছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। সুভো ঠাকুর লিখেছেন পরিমিত, তাঁর বইয়ের সংখ্যা স্বল্প, কিন্তু স্টাইলে অনন্য। তাঁর কলম জন্ম দিয়েছে *মায়ামৃগ, নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে, অলাতচক্র, অতন্দ্র আলতামিরা, প্যানসি ও পিকো* । তাঁর আর একটি গ্রন্থ *বিস্মৃতিচারণা*, যা শেষ জীবনে রচিত। *বিস্মৃতিচারণা*-র মেজাজ যৌবনে লিখিত *পয়েট টেগর কে হন তোমার* - এর মতই বিদ্রোহী। *বিস্মৃতিচারণা* বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। সমীর সেনগুপ্তের ভাষায় 'তাঁর শেষ জীবনে *বিস্মৃতিচারণা*-য় প্রকাশ পেয়েছে ঠাকুরবাড়ির বিরুদ্ধে কুরুচিকর ক্ষোভ।' সুভো ঠাকুরের কলম ধারালো, আবেগে উত্তেজনায় টলমল। সনাতনপন্থীরা তাঁর লেখা পড়ে ভ্রু কোঁচকাতেন, নবীনেরা উল্লাসে জয়ধ্বনি তুলতেন। কিন্তু তাঁর কলমের তীক্ষ্মতা অস্বীকার করতে পারতেন না কেউ। লেখায় প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন গদ্যরীতি ও কবিতায় ছন্দের। ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যকে ঝেড়ে ফেলে *নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে* গ্রন্থটি লিখে সাহিত্যমহলে আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর *বিস্মৃতিচারণা*-র মধ্যে ঠাকুরবাড়ির শিল্প ও সংস্কৃতিতে যে অবদান তার ঐতিহ্য, গরিমার স্মৃতিচারণা কোথাও যেন ফল্গুধারার মত বহমান। ঠাকুরবাড়ির অবদানকে অস্বীকারের মধ্যেও যেন স্বীকারের স্রোত প্রবাহিত। পদ্যে 'অগ্রমিল' ছদ্মনামে তিনি এক নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজেকে তৃতীয় ব্যক্তি

হিসাবে ধরে নিয়ে অনেক সময় লেখা শুরু করতেন। 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর কোম্পানীর মদের মোচ্ছবের ওপর যে অনেক ছড়াই আগেকার কালের অনেক কাগজেই ছিলো কিনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বলা যেতে পারে প্রিন্স দ্বারকানাথ থেকে সুভো ঠাকুর অবধি এ ধারা ছিল প্রায় অক্ষুণ্ন। তবে প্রিন্স দ্বারকানাথ বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বেলে সাহেব-বিবি-গোলাম সমভিব্যাহারে ফোয়ারা ছোটাতেন শেরি এবং শ্যাম্পেনের আর সেখানে সুভো ঠাকুর প্রিন্সের সাক্ষাৎ নাতির নাতি, বর্তমানে মদের অবর্তমানে, ওদের উপর তলার ছাদের ঘরে, নিভৃতে নির্জনে বসে, লিখতো কিনা মদের উপর পদ্য – যার ফলশ্রুতি 'ডি-কেন্টার'। আর তারইতো উৎসর্গপত্রের একপ্রান্তে উৎকীর্ণ ছিল –

'আমার নামের যত বদনাম
তাহারি তিমির ঠেলে
যে সব বঁধূয়া দু-বাহু বাড়িয়ে
এসেছিল তনু মেলে,
তাহাদেরই স্মৃতি স্মরণ করিয়া
দিয়ে যাই মোর স্নেহ
গভীর নেশায় চুরচুরে আর
মাতাল এ মোর দেহ।'

পত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদনা

নানাকারণে অদ্বিতীয় সুভো ঠাকুর, তার মধ্যে প্রধানতমটি সম্ভবত বাংলা ভাষার স্মরণীয় শিল্পপত্রিকা *সুন্দরম* সম্পাদনা। আর্ট কলেজে পড়ার সময় *চতুরঙ্গ* পত্রিকার চার পাঁচ সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ত্রিশের দশকে তাঁর সম্পাদিত *মাসিক ভবিষ্যৎ* ও সচিত্র সাপ্তাহিক *অগ্রগতি* পত্রিকা দুটির দুঃসাহসিক লেখা, ছবি, পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জার অভিনবত্ব চমকপ্রদ ছিল। তবে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান শিল্পকথা সংক্রান্ত পত্রিকা *সুন্দরম* । 'বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে একমাত্র কলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা *সুন্দরম* '। *সুন্দরম*-এর উদ্দেশ্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও জনসাধারণ-এই তিনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা। *সুন্দরম* প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা দিবস', ইংরেজি ১৫ আগস্ট, ১৯৫৬। প্রচ্ছদ সজ্জা ও লিখন শিল্পী ছিলেন সত্যজিৎ রায়। *সুন্দরম* সব দিক থেকে ছিল অভিনব। *সুন্দরম*-এর নিয়মিত বিভাগ ছিল – সম্পাদকীয়, গ্রন্থজগৎ, খবরাখবর, প্রদর্শনী পরিক্রমা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, চলচ্চিত্র সমালোচনা। কীভাবে এমন একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা সুভো ঠাকুরের মাথায় এল? শোনা যাক সুভো ঠাকুরের বক্তব্য – 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর ব্যাপারে যে পরিবারের নাম আজও চিরস্মরণীয়, সেই পরিবারের আজ ঘরের খাবারে একান্ত অনটন ঘটলেও সুভো ঠাকুর সেই

পরিবারেরই একটি অধস্তন বংশধর। অতএব লাভ হোক, লোকসান হোক, অর্থের স্বচ্ছলতা থাকুক আর নাই থাকুক আর্ট জার্নাল অর্থাৎ কলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা তার একটি বের কোরতেই হবে।' ইজিপ্ট, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, তুর্কী, বাগদাদ প্রভৃতি দেশে ভ্রাম্যমান কলাপ্রদর্শনী দেখে তাঁর মনের মধ্যে জন্ম নেয় আর্ট জার্নালের ভাবনা। *সুন্দরমের* বানানবিধিতেও সুভো ঠাকুরের বিদ্রোহী সত্ত্বা উপস্থিত। বিদ্রোহী বানানবিধি, বিশেষত, কোনো কোনো ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত। বোলতে, কোরতে, কোরলে, বোললে ইত্যাদি। *সুন্দরমের* লেখক তালিকাতে কে নেই! বুদ্ধদেব বসু, বিনয় ঘোষ, কমল মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, চিত্তপ্রসাদ গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, গোপাল হালদার, মৈত্রেয়ী দেবী, লীলা মজুমদার। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মতো সদাব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে *সুন্দরম* পত্রিকা *জাপানের কুটির শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ* - এর মতো প্রবন্ধ লিখিয়ে নিতে পেরেছিল। এ কাজ খুব সোজা কাজ নয়।

কালের নিয়মে *সুন্দরম* একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণটা শোনা যাক সম্পাদক সুভো ঠাকুরের কাছ থেকে – '*সুন্দরম* কাগজ আট বছর চলে, বহু ঋণের দায়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে কত না নাকানি চোবানি খাইয়ে শেষ অবধি একদিন বন্ধ হয়ে গেল।' *সুন্দরমের* তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সম্পাদক সুভো ঠাকুর লিখেছিলেন – '... তাই *সুন্দরম* এখন যদি বন্ধ হোয়ে যায় তবে আফশোষের কি আছে? সুভো ঠাকুরের সম্পাদিত লোকসানের এই *সুন্দরম* বন্ধ হয়ে গেলে, নতুন সুন্দরম আরও যুগোপযোগী সুন্দরতর হোয়ে অন্য কোথাও অন্য কোনখান থেকে অন্য কোনো সুভো ঠাকুর না হোক, শুভ চৌধুরী, শুভ সরকার অথবা শুভ সিংহ ব্যবসায় লাভজনক উত্তম-অধমের নানাবিধ কতো সুচিত্র-কুচিত্র ছেপে, সেই সুন্দরমকে কার্যকারিতায়, আরও কতো না কৃতকার্যতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।'

কিন্তু সুভো ঠাকুরের এই স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়নি। কোনো শুভ চৌধুরী, শুভ সরকার অথবা শুভ সিংহ সুভো ঠাকুরের জুতোতে পা গলাতে পারেনি। সুভো ঠাকুরের শৈল্পিক জুতোতে পা গলানোর ক্ষমতা একমাত্র সুভো ঠাকুরেরই ছিল।

সুন্দরমের সম্পাদকীয়তে সুভো ঠাকুরের বক্তব্য – 'সৃষ্টির আনন্দ গড়ার মধ্যে যেমন অগোচরে বিদ্যমান, ভাঙার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে যে তেমনি। আবহমানকাল থেকে ভাঙার মধ্যেই বীজের আকারে গড়ার স্বপ্ন বিরাজিত। যে ভাঙতে জানে, সেই আদতে গড়তে জানে – যে গড়তে জানে, সেই একমাত্র ভাঙার অধিকারী।' এই ভাঙাগড়ার খেলায় বারবার মেতেছেন সুভো ঠাকুর। কখনও সফল হয়েছেন। কখনো 'কোনো ইতিবাচক ট্র্যাডিশনের জন্ম দিতে পারেননি।' কখনও ঠাকুরবাড়ির এই সৃজনশীল ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে 'with his long flowing beard and attire, which was like a flowing robe, he looked more like a seer', কখনও তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের চোখে 'বোহেমিয়ান', 'কালাপাহাড়', 'ব্ল্যাকশিপ'। তাঁকে নিয়ে একসময় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে তার স্বাক্ষর রয়েছে *আর্ট অফ সুভো ঠাকুর* সংকলন গ্রন্থটিতে। শান্তি চৌধুরী তাঁর জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি করেছেন *The Lonely Pilgrim* নামে।

এরপর আত্মবিস্মৃত বাঙালির কাছে তিনি বিস্মৃত চরিত্র হয়ে গেছেন। শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় সুভো ঠাকুর 'লোনলি পিলগ্রিম'-ই রয়ে গেছেন। তবে আশার কথা এই বিস্মৃতপ্রায় পথিকৃৎ-কে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। প্রতিক্ষণ প্রকাশনী *শিল্পীকথা : নির্বাচিত সুন্দরম* কয়েক খণ্ড প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই অসুন্দর সময়ে 'সুন্দরমের জীবনে জীবন যোগ করা'র প্রচেষ্টাকে কুর্ণিশ না করে উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস *সুন্দরম*-এর উদ্দেশ্য – 'শিল্পী, সাহিত্যিক ও জনসাধারণ এই তিনের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করা', তা সার্থক হয়ে উঠবে।

গ্রন্থঋণ স্বীকার : ১। নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে – সুভো ঠাকুর; ২। বিস্মৃতিচারণা – সুভো ঠাকুর; ৩। প্যানসি ও পিকো – সুভো ঠাকুর; ৪। বাংলা পত্রপত্রিকা – সম্পাদক ও সম্পাদনা কোরক; ৫। সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান; ৬। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন – সমীর সেনগুপ্ত; ৭। ধারাবাহিক – শারদীয় ১৪২১।

চিত্র পরিচিতি : সুভো ঠাকুরের ফটোগ্রাফ, সুন্দরমের প্রচ্ছদ।